একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Jamini Roy in 20th century's literary creation
বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টিতে যামিনী রায়

Name of the Author: **Dr. Tania Mondal**

Affiliation: **Assistant Teacher, Government School, West Bengal, India**

Abstract: In the 20th century, Jamini Roy created an unprecedented artistic language by merging modernism with the folk art of Bengal. The contemporary modernist literary community of Bengal was captivated by his persona, his canvases, and the philosophy behind his art. Bishnu Dey frequently celebrated through his poems and essays, the profound philosophical wisdom, historical consciousness, eternal truths and uncompromising mindset that lay beneath the surface of Jamini Roy's deceptively simple paintings. The essays written about Jamini Roy by Sudhindranath Dutta and Buddhadev Basu are also of significant importance. Furthermore, Jamini's artistic view is revealed in two essays transcribed by Debiprasab Chattopadhyaya. The article explores the various ways in which Jamini Roy's presence and influence are reflected in the writings of the writings of the literary figures mentioned.

Keywords: Jamini Roy, Poetry, Essay, Universal Imagination, Historical Consciousness, Patua, Modernity

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সৃষ্টিতে যামিনী রায়

ড. তানিয়া মণ্ডল

ভূমিকা - চিত্র ও সাহিত্য দুটি ভিন্ন শিল্প মাধ্যম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দুই সৃজনশীল শিল্প মাধ্যমের প রস্পরমুখী আদান প্রদান চলতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে যামিনী রায়কে (১৮৮৭-১৯৭২) কেন্দ্র করে এই আদান প্রদানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। তিনি সাহিত্যিক নন, সাহিত্য রচনা তাঁর মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু সাহিত্য জগতের সঙ্গে নানা দিক থেকে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯৩) প্রমুখ স্বনামধন্য সাহিত্যিকের কলম অলঙ্কৃত হয়ে ওঠে তাঁর শিল্প চেতনার স্পর্শে।

১. কাব্য সংযোগে যামিনী রায়

শিল্পী সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে ছবি আঁকেন, ভাস্কর্য গড়েন আর সাহিত্যিক সেই শিল্পকীর্তি দেখে শিল্পরসে অভিভূত হয়ে কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেন। এভাবেই শিল্প ও সাহিত্য সম্মিলিত কর্মযোগে সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ চল্লিশের দশকে যামিনী রায় এবং তাঁকে ঘিরে থাকা সাহিত্যিকগোষ্ঠীর হৃদ্যতার সম্পর্ক এই বিষয়ের উদাহরণ হতেই পারে। যামিনীর সাহিত্যিক বন্ধুদের লেখায় ফুটে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব, শিল্পচর্চার নানা দিক। বিষ্ণু দের *পূর্বলেখ* (১৯৪১) কাব্যগ্রন্থে 'যামিনী রায়ের একটি ছবি' (১৯৩৭) শীর্ষক কবিতাটি যামিনীর ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা। [১] *রামায়ণে* উল্লিখিত জটায়ুর কল্পমূর্তি চিত্রায়ণে সামান্য লক্ষণের জগত সম্পর্কে যামিনীর দর্শনকে বিষ্ণু অভিব্যক্ত করেছেন এই কবিতাটির মাধ্যমে –

নীলিমার শূন্যস্রোতে যত, বিহঙ্গম!
...যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়
পক্ষবিধুনন, আর অকস্মাৎ নেমে যায়
উর্ধ্বগ্রীব আশা![২]

যামিনী পুত্র অমিয় রায়ের উদ্দেশে 'যামিনী রায়ের এক ছবি' শিরোনামে (*আলেখ্য,* ১৯৫৮) বিষ্ণু র লেখা আরেকটি কবিতায় যামিনীর ছবির প্রতি কবির আকর্ষণ এবং ছবির ভাবমূল্য ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষায় –

প্রকৃতি বৃথা গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।[৩]

অন্য এক শিল্পীর ছবির রেখা রঙের বিস্তার দেখে মুগ্ধ কবি বিষ্ণু অনুভব করেন ছবিটি যামিনীর প্রতিদিনের ছবির একটি অংশ মাত্র। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী যে রূপরাজিকে গড়ে তুলেছে তার একটি মূহূর্ত যামিনীর আঁকা ছবিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার মধ্যে থাকে শিল্পীর পঞ্চাশ বছরের সাধনা , তাঁর বংশ, চৈতন্য, ভুলে যাওয়া অতীতের পুণর্জাগরণ, দৈনন্দিন সত্য, সমগ্র দেশ, জন্মভূমির প্রতি রক্তের টান, সমগ্র পৃথিবীর ছায়া। বিষ্ণুর 'তাই তো তোমাকে চাই' কবিতাটি তে এই অনুভূতি ব্যক্ত হয়।[৪] যামিনীর জন্মদিন উপলক্ষে বিষ্ণু তাঁকে 'চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা' (রচনাকাল: ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ থেকে ২৯ মে) দীর্ঘকবিতা উৎসর্গ

করেন। হাহাকার–হানাহানির পৃথিবীতে আনন্দরূপ ও চিরন্তনতার সন্ধানী যামিনী রায়ের ভাবনায় অভিভূত কবি বিষ্ণু দে মনেপ্রাণে সেই আনন্দরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়ে লেখেন –

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা
দেখেছি হয় তো কোনোদিন...[৫]

কবিতার কিছু পংক্তি যামিনীর সংগ্রামকে যেন কুর্ণিশ জানায়। যামিনী সহজ অর্থ উপার্জনের পথ ছেড়ে শিল্পসত্য ও আনন্দরূপের সন্ধানে অর্ধাহারে–অনাহারে দিন কাটালেও হৃদয়ের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে স্বেচ্ছায় জীবন সংগ্রামের কঠিন পথে পা বাড়ান । শৈশবের স্মৃতির পাতা উলটিয়ে নবসৃষ্টিতে মেতে ওঠে ন। অভাবের কাছে হার না মানা মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে কবি বলেন –

স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসী ঈস্টারে।[৬]

এই কবিতার অন্দরেই কান পাতলে শোনা যায় যামিনী রায়ের সমকালীন চিত্রচর্চায় ইতিহাস। যামিনী যেমন করে সমকালের গ্লানি থেকে ছবিকে মুক্ত করে স্বপ্নময় পরিবেশ রচনা করে প্রেমকে লালন করেছেন, ছবিতে এনেছেন অরণ্যের শীতলতা, লোকসমাজের কণ্ঠস্বরকে তুলেধরেছেন, সর্বোপরি প্রকৃতি ও শিশুর সরলতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন; কবিও সেই পথে বিংশ শতাব্দীর সমাজ, রাজনৈতিক ও শিল্পচর্চার ওই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় দেখেছেন। *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থের 'শিল্পের আবেগ' কবিতায় কবি যখন বলেন –

এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,
একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বোয়া যায়
অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার।[৭]

তখন মনে হয় যামিনীর জীবন সংগ্রাম এবং কঠিন পরিস্থিতে তাঁর হার না মানা ব্যক্তিত্বের বন্দনা করছেন বিষ্ণু। যামিনী ও তাঁর ছবিকে ঘিরে কবির জীবনে যে আশ্রয় তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই অপর একটি কবিতায়। *সন্দীপের চর* (১৩৫৪) কাব্যগ্রন্থের 'কঙ্কালীতলা' কবিতায় কবি কোথাও যামিনী রায়ের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু কোথাও গিয়ে মনে হয় কবিতাটিতে ব্যবহৃত বিশেষ কিছু শব্দবন্ধ ও আবেগ আসলে যামিনীর প্রতি। সত্তার পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি শিল্পীকে ভালোবেসে, সম্মান জানিয়ে মনে মনে বেঁধে থাকার নিরব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন –

তবু শুকতারা
তোমাকে জেনেছি চিত্তে পৃথিবীর মর্ত্য পারিজাতে
বেঁধেছি হৃদয়ে দুইহাতে
বিভেদের পাহাড়ে নদীতে আমাদের মিল মীনকেতু
আপন আপন সত্তা আনে কড়ি কোমলের গানে।[৮]

বিষ্ণুর কবিতায় জরাজীর্ণ স্বার্থমগ্ন সমাজের ছবি থাকলেও শেষ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয় আশার বাণী, আনন্দরূপ জগতের সন্ধান। কবি বুঝেছিলেন বর্তমান ছিন্নভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণ চেতনার মধ্যে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তবে তাঁর এই অতীতের দিকে যাত্রাকে সুখবিলাস বলা যায় না। বর্তমানের প্রাক্ষাপটে অতীতকে গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে সজীব করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। ঐতিহ্যচেতনার ভিত্তিতে তিনি আরো দৃঢ় হতে পারেন যামিনীর ছবি ও জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণায়। লোকচেতনা আর যামিনী তাই তাঁর কবিতায় মিলেমিশে থাকে । *অন্বিষ্ট* (১৯৫০) কাব্যগ্রন্থে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'প্রতীক্ষা' কবিতাতে তিনি লেখেন –

তুমি করো গান,
তুমি আঁকো ছবি,
কর্মে রচনা করো তুমি নব প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।[৯]

এই স্বীকারোক্তি তাঁর কবিতায় বার বার ফিরে আসে। কবি নির্দ্বিধায় আবেগ তাড়িত হয়ে 'পাঁচ প্রহর' কবিতায় বলতে পারেন –

আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান–
পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত–[১০]

যামিনী এবং বিষ্ণু উভয়েই সমকালকে উপেক্ষা করার প্রশ্নে বারবার দীর্ণ হয়েছেন। তাই কবি লিখছেন – 'আমরা উভয়ে বারেবারে দেখেছি সে সম্মিলিত বাদ প্রতিবাদ'।[১১] বিষ্ণু দে *ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে* (১৯৬৯) কাব্যগ্রন্থের 'চেনা মুখের আদল' কবিতায় যামিনী রায়ের সর্বজনীন রূপকল্পনা য় মুগ্ধ হয়ে প্রেয়সীর মুখচ্ছবিকে তাঁর ছবির সঙ্গে তুলনা করে লেখেন –

এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল।
...এ মুখ সাবেক, দেশি, বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি – যেন যামিনী রায়ের,
...সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল।[১২]

এই একই উপলব্ধি পাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩–১৯৯৫) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। তিনি জানান তাঁর চেতনায় জেগে থাকা যামিনী রায়ের আঁকা সর্বজনীন মাতৃমুখের ছবি তিনি কখনই ভুলতে পারেন না। কারণ সেই মুখের মধ্যে তিনি খুঁজে পান তাঁর মাকে, স্ত্রীকে, মেয়েকে। [১৩] যামিনী রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বি স্ময়ে মুগ্ধ বিষ্ণুর বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত যামিনী রায় বিষয় ক কিছু প্রবন্ধ, যামিনীর লেখা দুটি প্রবন্ধ, যামিনীর সাক্ষাৎকার ও বিষ্ণুকে লেখা যামিনীর কিছু চিঠিপত্র নিয়ে *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে*

কয়েকটি দিক (১৩৮৪) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে যামিনীর শিল্পদর্শন, তাঁর বলা নানা তত্ত্বকথা সহ যামিনী ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিষ্ণুর আবেগ, বিশ্লেষণ, প্রত্যয়, নিবেদন গ্রন্থটিকে অমূল্য করে তোলে।

যামিনী রায়ের সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে বিষ্ণু দের পরে স্মরণে আসে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে *Longman's Miscolini*-তে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষা য় রচিত সুধীন্দ্রনাথে র 'যামিনী রায়' শিরোনামের দীর্ঘ প্রবন্ধটি যামিনীর ছবির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা। প্রগতিশীল লেখক-সম্মেলনে সুধীন্দ্রনাথের যামিনী রায় বিষয়ক বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখে বুদ্ধদেব বসু আকৃষ্ট হন। যামিনীর শিল্পসত্তার প্রভাবে 'যামিনী রায়' শিরোনামে বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি *এক পয়সায় একটি* (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থে ও পরে *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা* –র (১৯৫৩) প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে কবি আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের বিষয়ী ভাবনার বিপরীতে শিল্পীর ত্যাগ, সাধনার মহত্ত্বের জয়গান গেয়েছেন –

জীবনের রসে শিল্পেরে দিলে প্রাণ,
জ্বালালে জীবন শিল্পের শিখা থেকে।
তুমি জয়ী হ'লে আপনার প্রাণ নিঃশেষে করে দান,
আমরা পতিত খানিকটা হাতে রেখে।[১৪]

'শিল্পী যামিনী রায়কে নববর্ষের উপহার' দেওয়া বুদ্ধদেবের 'আধা-গল্প আধা-প্রবন্ধ' -এর আদলে রচিত 'তিনজন' (*বৈশাখী*, ১৯৪৬) রচনাটিতে নরেশ গুহ (১৯২৩-২০০৯) চিত্রশিল্পী চরিত্রটির 'আবেগকম্পিত' বক্তব্যের সঙ্গে যামিনীর বক্তব্যের মিল খুঁজে পেয়ে তাকে যামিনীর 'সাহিত্যিক প্রতিমা' বলে মনে করেছেন।[১৫]

অবাঙালি সাহিত্যিক ও অভিনেতা নিসিম ইজেকিয়েল (১৯২৪–২০০৪) যামিনী রায় কে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন 'Jamini Roy' শিরোনামে। কবিতাটিতে শিকড়ের সন্ধানে যামিনী রায়ের যাত্রা , তাঁর ছবির বিশেষত্ব এবং শিল্পীর প্রতি কবির অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

২. প্রবন্ধ ও গদ্যে যামিনী রায়ের চিত্র-শিল্প–সাহিত্যভাবনা

যামিনী রায় ছিলেন অত্যাশ্চর্য কথক। কথায় গ্রাম্য ধাঁচ এবং কিছু মুদ্রাদোষ থাকলেও তাঁর কথায় ফুটে উঠত শিল্প ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর দর্শন। অসংখ্য গুণগ্রাহী সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে লেখবার জন্য বললেও তিনি নিজে হাতে বিশেষ কিছু লেখার আগ্রহ দেখাননি। যামিনী রায়ের নামে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগই কোন না কোন লেখক দ্বারা অনুলিখিত। তাঁর স্মৃতিকথা 'ছেলেবেলা' , প্রশান্ত দাঁ কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে *যুগান্তর* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) পত্রিকায় 'ছোটদের পাততাড়ি' পাতায় প্রকাশিত হয়। ছোটদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা মনোগ্রাহি রচনাটিতে বর্ণিত শিল্পীর গ্রামের বাড়ি, বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, বেলিয়াতোড়ের প্রকৃতি-সংস্কৃতি, সেইসঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহ , আর্ট কলেজে আসা, গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে কলকাতার পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার কথা গুলি শিশুমনের প্রেরণা সৃষ্টি করে। চার-পাঁচ বছর বয়সে খেলারছলে রঙিন পাথর দিয়ে আঁকা ছবি দেখে তাঁর পিতার এক শিল্পীবন্ধুর আশীর্বাণী তাঁর শিশুমনে প্রভাব ফেলে। গ্রামীণ শিল্পীদের থেকে তাঁর দেখা, শোনা ও শেখা চলতে থাকে। বাঁকুড়া জেলার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠানো 'সমাজ' ছবিটির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে একটি গিনি উপহার পেয়ে তিনি প্রথম উপলব্ধি

করেন – 'আমিও ছবি আঁকতে পারি।'[১৬] এরপর স্কুলের পড়া শেষ করে কলকাতার শিল্প বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তাঁর চাহিদার সঙ্গে শিল্পবিদ্যালয়ের পরিবেশের মিল না থাকার কারণে ভালোবাসা সম্মান সত্ত্বেও সেখানে তিনি স্থিতু হতে পারেননি; একাধিক বার তিনি সেখানে ভর্তি হয়েছেন ও ছেড়েছেন। তাঁর মন 'খাঁচায় বদ্ধ পাখির মত' ছটফট করত। নিজ বাসভূমের আকাশ, বাতাস, মাটি, পাথর, গাছপালা, সাঁওতাল ছেলে মেয়ে, পাহাড়, নদী, সবুজ মাঠ চোখের সামনে ভেসে উঠত।[১৭] পাশ্চাত্যধর্মী ছবি আঁকা ছেড়ে নতুন আঙ্গিকে শিল্পসৃষ্টির পিছনে কোন রহস্য কাজ করেছে এই প্রবন্ধটি পড়ে খানিকটা তার ঈঙ্গিত পাওয়া যায়।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬৭-১৯৩৮) জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত একটি স্মারক পত্রিকায় 'স্মৃতিকথা' নামে এক নাতিদীর্ঘ রচনায় যামিনী রায়ের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির লোকজনের সুসম্পর্কের দিকটি পরিস্ফুট হয়। রচনাটির শুরুতেই তিনি বলেন – "প্রতিদিনই সেই তিন ভায়ের কথা মনে পড়ে ও আমার প্রতিদিনের জীবনের পথ আলোকিত করে রাখে। তাঁদের সব ভালোবাসার কথা লিখে জানানো আমার পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, অন্তরের এই ভাব কারো পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা বলতে পারি না।"[১৮] 'নিত্য কর্মই' তাঁকে সমরেন্দ্রনাথ (১৯০১-১৯৭৪), গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) প্রতি 'শ্রদ্ধা অর্পণের শক্তি দান করেছে'।[১৯] স্মৃতিতে ভেসে ওঠা একটি মাত্র ঘটনা উত্থাপনের মাধ্যমেই গগনেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা এবং তাঁর প্রতি গগনেন্দ্রনাথের আবেগের মূল্যবান রসঘন মু হূর্তটির পরিচয় পাওয়া যায়। Indian Society of Oriental Art –এ ছবির প্রদর্শনী উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুযায়ী নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনীর আঁকা ছবিগুলি তাঁর কাছে নিয়ে যান। চলৎশক্তি ও বাক্‌শক্তি রহিত অসুস্থ গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীতে যামিনীর আঁকা ছবি দেখে যামিনীকে জড়িয়ে ধরে সজল নেত্রে ছবির প্রশংসা করে তাঁর অন্তরের কথা জানিয়ে দেন।

সাহিত্যিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯৩) কর্তৃক অনুলিখিত যামিনী রায় সাক্ষরিত দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পটুয়া শিল্প' ও 'রবীন্দ্রনাথের ছবি'। এই প্রবন্ধ দুটি লিখতে তাঁর অনেক সময় লাগে কারণ যামিনী সাধারণ প্রবন্ধকারের মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতেন না। দেবীপ্রসাদ দিনের পর দিন তাঁর কথা শুনে-ভেবে-বুঝে খসড়া প্রস্তুত করে তাঁকে শুনিয়ে তাঁর মতামত অনুযায়ী সংশোধন করেছে ন। 'পটুয়া শিল্প' প্রবন্ধটির (*সংকেত*, অগ্রহায়ণ ১৩৫০) শুরুতেই বাংলার চলিত চিত্রকলার সাধারণ বর্ণনা করে পটের ছবিকে প্রসাধনের প্রচেষ্টা সংস্কারের উৎসাহ হীন ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প ; চরিত্রগতভাবে অভিজাত, বেদ - বেদান্তের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দেবমূর্তি, প্রতিমা কে পালাপার্বণের শিল্প বা পোশাকী শিল্প এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পটুয়া ছবি আর কালীঘাটের ছবিকে অনেকেই সমার্থক মনে করলেও তাঁর মতে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। বিদেশিরা মূলত কালীঘাট থেকে পটুয়া ছবি সংগ্রহ করেছেন বলে এই ভ্রম তাদের মানায়, কিন্তু এদেশীয় সমালোচক দের 'বিদেশী ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি' তে তিনি ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন।[২০] ছবির মধ্যে কোন বক্তব্য প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ 'বলবার কথা' বা প্রসঙ্গ আর কীভাবে ছবিকে প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ 'বলবার ভাষা' বা আঙ্গিক পটচিত্রকে এই দুদিক থেকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। পটুয়া শিল্পে বলবার কথায় বাস্তব অনুকৃতি ব্যতিরে কে প্রকৃতির মূলবার্তাটি অতি কৌশলে প্রকাশ করতে দেখা যা য়। এদিক বিচার করে

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে পটের ছবির মিল পাওয়া গেলেও পার্থক্য ঘটে যায় পৌরাণিক জগতে আশ্রয়কে ভিত্তি করে। অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক চিত্রে পুরাণে বিশ্বাস ও ভাবনার ঐক্য ছিল না । সেই সময়কার চিত্রে খাপছাড়া ভাবে সাংকেতিক চিহ্ন আসার ফলে সব মিলিয়ে একটা জগৎ তৈরি হতে দেখা যায় না। বাংলার পটুয়ারা পুরাণের উপর স্থিত সেই সংহত সামান্য লক্ষণের জগতের সন্ধান পেয়েছিল এবং এতেই বিশ্বাস বেঁধেছিল। যদিও পৌরাণিক বিশ্বাস অভ্যাসে পরিণত হওয়ায় পটচিত্র গতানুগতিক হয়ে পড়ে । নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না ঠিকই, কিন্তু তারা মূল পটুয়া ছবির প্রচলিত ধারার অনুবর্তী হয়ে থাকে। যামিনী বলবার ভাষা অর্থাৎ আঙ্গিক প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাংলার পটুয়ারা আড়ম্বর-জটিলতাহীন আশ্চর্য রকমের ঘরোয়া ভাষায় পৌরাণিক জগতের কথাকে বলতে শিখেছিল । অথচ আমাদের দেশে এর সমান্তরালে চলা ধ্রুপদী শিল্প বা 'পোশাকী শিল্প'–র গম্ভীর ভাষা, শৌখিন দৃষ্টি, অতি সংস্কৃত ভঙ্গিমা ছিল। এই মান্যতাপ্রাপ্ত শিল্প আঙ্গিকের পাশে সহজ কথাকে সহজে বলতে পারা পারার কৃতিত্বে পটুয়া শিল্প অনন্য হয়ে উঠেছি ল। পটুয়া ছবি দুটি দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে পেরেছিল এবং একটি ব্যতিক্রমী ধারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পেরেছিল। প্রথমত, পটুয়া ছবি সংহত পুরাণের জগতে পেরেছিল বলে তাতে কৃত্রিমতা আসেনি, আশান্তি আসেনি; এইজন্য অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক ছবির ধারা লুপ্ত হয়ে গেলেও পটুয়া ছবি বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, পটুয়া শিল্প দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, ওঠা-পড়া ভাঙা-গড়ার সাক্ষী হওয়ায় তার ভাষা ছিল ঘরোয়া আটপৌরে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীরা পৌরাণিক জগতে স্থিতু হতে পারেনি আবার পোশাকী শিল্পের ভাষাও আয়ত্ত করতে পারেনি বলে এই অবস্থায় পৌঁছাতে পারেনি। তাই অজ্ঞানে যা তারা আবিষ্কার করল তা সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শৌখিনতার জৌলুসে দিকভ্রষ্ট হল, আবহমান কাল ব্যাপ্ত হল না; 'বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেইরকম'।[২১] রিয়েলিজমের চর্চায় অকল্পনীয় নিখুঁত ও পালিশ করার দরুন শিল্পের গড়ন হারিয়ে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ল। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্পও হাঁপিয়ে উঠ লে পরিশ্রান্ত শিল্পীরা রিয়েলিজমের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য পথে প্রাণের সন্ধানে মরিয়া হইয়ে উঠল। খ্রিস্টের পুরাণ বিশ্বাসে চিড় ধরার ফলে সেই পথে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না; হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়ল যে, 'পথ আর নেই'।[২২] তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাংকেতিক চিত্রের ফর্মকে সচেতনভাবে শুদ্ধ-বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করল। রিয়েলিজম থেকে বেরিয়ে এসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রের মূল সত্যের পথে পা বাড়ানোর এই সচেতন প্রয়াসে শিল্পীদের অনিবার্য প্রয়োজন ছিল শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। কেননা, যিনি আইন অমান্য করবেন তাঁকে তো প্রথমে আইনের ব্যাপারে পাকা হতে হবে। পিকাসো, মাতিস সকলেই রিয়েলিস্টিক ছবি আঁকার আঙ্গিক চর্চায় দক্ষতা অর্জন করার পরই নতুন পথের সন্ধান করেছেন। আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পে ভাঙ্গনের রূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে যামিনী বলেছেন ইউরোপীয় শিল্পীরা যদি 'গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত' তাহলে এ অবস্থা হত না ।[২৩] অর্থাৎ শৌখিনতার চটকে, বিলাসিতার আতিশয্যে শিল্পসৃষ্টির মূল উৎসকে তারা যদি ভুলে না যেত তবে ইউরোপীয় শিল্প এমন ভাঙ্গনের মুখে পতিত হত না। 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' (*কবিতা*, আষাঢ় ১৩৪৮) প্রবন্ধটিতেও ইউরোপীয় শিল্পের এই সমস্যা ও উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ছবিকে বুঝতে বলেন। তাঁর মতে 'রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাঁটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে'।[২৪]

চিত্রসাধনার ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করে যামিনী জানান, বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনের রীতিনীতি অনুশীলন ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ প্রাগৈতিহাসিক চিত্রের মত শুদ্ধ সত্যের সাধনা করেন। চিত্রসাধনায় তিনি নবাগত তা তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় থাকে না । ‘ কল্পনার আসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে ’ তাঁর অনভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ে যায় ।[২৫] গুটি কয়েক ছবির স্থানে স্থানে রিয়েলিজমকে অস্বীকার করতে না পারার সমস্যা প্রথম শ্রেণির যে কোনো আধুনিক শিল্পীরই সমস্যা। আসলে সত্যিই রিয়েলিস্টিক চিত্রকলায় আর অতি-আধুনিক ইওরোপীয়, চিন জাপান সারাবিশ্বের চিত্রকলায় দৃষ্টির কোন তফাৎ নেই। ভারতবর্ষের শিল্পই রিয়েলিজমের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পৌরাণিক জগতে স্থিতিলাভ করে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যামিনী রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করেন তার শক্তি, ছন্দ, বৃহৎ রূপের যে আভাসের জন্য। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মতো ছবি সম্পর্কে অনেকেই অভিযোগ করেন সেই সমস্ত ছবিতে অ্যানাটমির বড় অভাব। কিন্তু যামিনী এ ই ধরনের ছবিতেই সবচেয়ে বেশি অ্যানাটমিবোধের ব্যবহার দেখতে পান। তাঁর মতে শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেওয়া ছাড়া অ্যানাটমি শাস্ত্রের আর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। তাঁর ছবিতে আঁকা মানুষের ওজন-শিরদাঁড়া আছে, দেখলে মনে হয় না সেটা নেতিয়ে পড়বে বা হাওয়ায় দুলবে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি বলিষ্ঠ তা ওই হাড়ের জোড়ে, ছন্দগঠনে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশ অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রকলার ভাববৈশিষ্ট্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে তিনি বিস্মিত হন। এই বিষয়টির নিহিতার্থ বোঝাতে যামিনী চাক্ষিক চিত্রায়ণ ও কাল্পনিক তথা ভাব চিত্রায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের মানুষ তাই তাঁর ছবিতে পৌরাণিক জগতের স্থিরতা বা নিশ্চয়তা নেই। তাঁর ছবিতে ভারতীয় রূপকল্পনার বিশেষত্ব তাই ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়। প্রবন্ধের শেষে ছবি বিষয়ে যামিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত আলাপচারিতার স্মৃতি ভেসে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ একবার যামিনীকে বলেছিলেন তাঁর আর্ট স্কুলে পড়ার বিদ্যা নেই বলেই হয়তো তাঁর ছবি সম্পূর্ণ হয় না। যামিনী তখন রবীন্দ্রনাথকে ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চান প্রথাগত শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ছবি আঁকা যায়, যদি তার মধ্যে রসপোলব্ধি থাকে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আঙ্গিক নয় সবার আগে আসে উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই গুণটি আছে বলেই যামিনীর চোখে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথের ছবি খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের এবং ভারতীয় শিল্পকলার ভাববৈশিষ্ট্য যুক্ত; এই বাক্য দুটিকে স্ববিরোধী মনে হ লেও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পী , তাঁর মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভাব থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। যদি ভারতীয় মনোভাব, ভারতীয় শিল্পকলার ভাবধর্মী শিল্পের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ছবিতে থেকে থাকে তাহলে তাঁর ছবি খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিকের হবে কী করে। এখানে খাঁটি ইউরোপীয় আঙ্গিক বলতে যামিনী রিয়েলিজমের বিপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক সংকেতধর্মী ছবি আঁকার সর্বাধুনিক ইউরোপীয় শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পীদের চিত্র আঙ্গিকের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তাই প্রবন্ধের মধ্যে ইউরোপীয় শিল্পীদের সমস্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির সমস্যা এক হয়ে গেছে। যামিনীর লেখায় নিজের ছবির বিশ্লেষণ পড়ে অভিভূত শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ২৫ মে ১৯৪১ এবং ৭ জুন ১৯৪১ তারিখে পরপর দুটি পত্র লেখেন। প্রথম পত্রে বলেন – “আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় ও

অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না ।"[২৬] রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে নিজের ছবি সম্পর্কে যামিনীর মতামতকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করেই বোঝা যা য়। তাঁর মন্তব্যে এদেশের সমালোচকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পাশে যামিনী রায়ের দৃষ্টির গভীরতা ফুটে ওঠে।

উপসংহার - যামিনী রায় প্রকৃত অর্থেই চিত্রশিল্পী, তাই সাহিত্য রচনায় আগ্রহী না হলেও তাঁর কথাবার্তা য় শিল্প সম্পর্কে গভীর অনুভূতি ফুটে ওঠে। কলকাতার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে যামিনী রায় তাঁর ছাপ রেখে গেছে ন। আধুনিক কবি সাহিত্যিকেরা তাঁর শিল্পসৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রচিত সাহিত্যগুলি তথ্য সমৃদ্ধ এবং ভাবব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে । যামিনীর সৃষ্টি কীর্তিতে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও চিত্রকলা অনেকদূর সম্ভাবিত হয়ে ভিন্ন পথ নির্মাণ করেছে।

তথ্যসূত্র

১। সেন, অরুণ (২০২০)।*যামিনী রায় বিষ্ণু দে: বিনিময়*। কলকাতা: প্রতিক্ষণ। পৃ. ৪৫
২। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। *কবিতাসমগ্র*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১২৬–১৩৭
৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ১২৭
৪। বিষ্ণু দে (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ২৭৮–২৭৯
৫। দে, বিষ্ণু (১৪১৭)। *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৪৫
৬। পূর্বোক্ত। পৃ. ৪৬
৭। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ১৮২
৮। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১১
৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৮৩
১০। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৭
১১। দে, বিষ্ণু (২০০৪)। পূর্বোক্ত। পৃ. ২১১
১২। দে, বিষ্ণু (১৪০৫)। *কবিতা সমগ্র*। তৃতীয় খণ্ড। কলকাতা: আনন্দ। পৃ. ১১০
১৩। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি (১৯৯৭)। বসু, দেবতোষ (সম্পাদিত)। *এই কাব্যে এই হাতছানি*। কলকাতা: দেজ। পৃ. ৪৬–৪৭
১৪। বসু, বুদ্ধদেব (১৯৫৩)। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: নাভানা। পৃ. ৬৯
১৫। গুহ, নরেশ (২০১৫)। *যামিনী রায় এক আধুনিক চিত্রকর*। কলকাতা: লালমাটি। পৃ. ২৬–২৮
১৬। মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ (সম্পাদিত, ১৯৭২)। রায়, যামিনী। 'ছেলেবেলা'। *যুগান্তর*। ১৫ ফেব্রুয়ারি। পৃ. ৮
১৭। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮
১৮। দাঁ, প্রশান্ত (সম্পাদিত, ২০০৫)। *রূপতাপস যামিনী রায়*। কলকাতা: প্রতিভাস। পৃ. ২৯৮
১৯। পূর্বোক্ত। পৃ. ২৯৯
২০। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (২০১৭)। *যামিনী রায় পত্রাবলী ও প্রবন্ধ*। কলকাতা: অনুষ্টুপ। পৃ. ৬৮
২১। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৪
২২। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫
২৩। পূর্বোক্ত। পৃ. ৭৫

২৪। দে, বিষ্ণু (১৩৮৪)। *যামিনী রায়: তাঁর শিল্পও চিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক*। কলকাতা: আশা প্রকাশনী। পৃ. ৭০
২৫। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮০–৮১
২৬। গুহ, নরেশ (২০১৫)। পূর্বোক্ত। পৃ. ৮৪–৮৫